# ভুল সত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ .
বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

রা-স্বা

ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়

স্মরণে

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের এই তরুণ অধ্যাপকটি আমার প্রিয়পাত্র ছিল। অত সুন্দর হৃদয় ছিল যার, তার অস্তিত্ব কেন আক্রান্ত হল অসহনীয় বিষাদে! তাই বিদায়। পরমপিতা তাকে আশ্রয় দিন পাদপদ্মে, এই প্রার্থনা। তার হৃদয়ের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক।

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের আর একখানি উপন্যাস

শূন্যের উদ্যান

# ভুল সত্য

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উচু টুলের ওপর পা দুখানা তোলা। দুপায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ হাতের কাছে ছোট্ট টেবিলের ওপর একটা দামী ট্রানজিস্টার রেডিও। রেডিওর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজী চুরুটের বাক্স, দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিকরে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড় করে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিওতে। তিনি খবরটায় মন সং। কবার চেষ্টা করেছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভা ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয়পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নিচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে—এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে, যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা··· সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ। মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দুদিন পর। সরোজিনী একটু পাগলী আছে। রামপ্রসাদী

সুরে সারাদিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগী ঘর। বারান্দা থেকে অনেকদূর দেখা যায়। খুব বেশী গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বেড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ''দের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে ন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা ' দিয়ে গিলে ফেলেন। বীয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন— কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন .বার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বীয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে সেই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয় নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারো এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্তি বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে—ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শান্তু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে—ও কাকা।

ছাড়বে না। দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বল্লেন—হুঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—শরীরটা ভাল নেই, কেন?

—সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেন্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

—কত?

—পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন—খামোখা।

—এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাবো?

—গেলেই ভাল। নইলে আরো টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে?

—হিসেব তো এখনো শেষ করি নি। খরচ তো এখনো হচ্ছে। তবে হাজার ত্রিশেক বেরিয়ে গেছে।

—আরো যাবে।

—লস্ হবে বলছ?

—হবে।

—কেন?

—ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ?

—করিয়েছি।

—কী বলে সার্ভেয়াররা?

—কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নিচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

—হুঁ, দিগিন বল্লেন।

—কী করব ?

—যা বলার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনো অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কলকাতায় যে নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খদ্দের ইণ্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাবে।

দিগিন চোখটা খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন—যা ভাল বোঝ করো।

শান্নু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে—তুমি একদম অ্যাডভাইস দিচ্ছ না। গত দু বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও-বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখেছ ? কত টাকা জলে যাবে !

—সোপস্টোন তো আর হীরে-জহরৎ নয়। ওর পিছনে দু'বছর অত টাকা ঢালা বোকামী হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শান্নু রেগে গিয়ে বলে—কিন্তু ভুটান গভর্নমেণ্ট অত টাকা চাইবে কেন ? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন—তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যবসা করবে।

—কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে ? ওরা দেবে ?

—খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাও নি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন ?

—কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

—ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি লাভ চাইছি না। খরচটা যদি উঠে আসত।

—উঠবে না। বরং আরো ট্যাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। তুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত!

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ তুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল—কাছে-পিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনো খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়। লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরো তিনজন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশীই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চন-জঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

—ছোটকাকা।

—হুঁ।

—অনেক লস হয়ে গেল।

—বুঝতে তো পারছি।

—বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে!

—কী করব?

—কিছু একটা করা তো দরকার।

—দুবছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ—এ তো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডংকাও হয়, তবু ঐ চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শান্তু কোমরে হাত দিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে—তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

—যাচ্ছি না। গেছি। বলে আর একটা সরু মাদ্রাজী চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাৎ হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্ফূর্তিযুক্ত হয়ে বলেন—যা গেছে গেছে। ছেড়ে দাও। ঠিকাদারীটা ধরে রাখো। ঐটাই শেষ পর্যন্ত টিঁকবে।

—যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেও না।

—ভুলি নি বলেই তো বলছি। আরো যা লস্ হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শান্তু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সে যেতে না যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—চা।

—হুঁ।

ঠক্ করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে—কারা যেন আসছে আজকে আবার!

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—কারা?

—কী জানি! পুন্নি ঠোঁট উল্টে বলে—শুনছি কারা যেন আসবে।

—কত কে আসে! দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন—কার কথা বলছিস?

—তুমি বুঝি জানো না ? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

—ও। বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনো শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

—তা কী করবে ? পুন্নি জিজ্ঞেস করে।

—কী করব ? এলে আসবে।

—আমি সামনে যাবো না।

—সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন। চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

—আমি সামনেই যাবো না।

—কেন ?

—আমার ভাল লাগে না।

—ও। বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিও বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতার ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—আমি যা বলেছি শুনেছ তো।

—শুনলাম।

—আমি সামনে যাবো না।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

দিগিন 'হুঁ' দেন।

—ঠিক তো? পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

—কী করবে?

—তোর বদলে দক্‌লীকে দেখিয়ে দেবো।

—টের পাবে না?

—টের পাবে কেন? এতো বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দক্‌লীও তো আমাদের ভাগনীই! তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে—আহা।

দিগিন বলেন—কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে—দক্‌লী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি! তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেবার। তার আগের দিন একটা প্রকাণ্ড তরমুজ কিনে এনে তার একদিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের একধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজ-টাকে একবার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন, ভাইপো আবার তার দিকে গড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাকয়েক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম্ তৈরী করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তার কোনো ধারণা ছিল না দিগিনের। পরদিন বন্ধুদের এসে পৌঁছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে আসতে পরদিন সকাল।

বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ঐ তরমুজের ধারে কাছেও তারা ঘেঁষে নি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বীয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। একমাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিংয়ের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারীর কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগী ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেন নি। এখনো তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধা-ধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশ-ভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বৌ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকীত্বটা সেই চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগী ঘরটার আশেপাশে আরো

দুখানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙে নি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজ জনের ওষুধের স্টেশনারী, বড় ভগ্নীপতি কয়লার ব্যবসা করে, ছোট ভগ্নীপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

## দুই

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটরসাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন—কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগন থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামী একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা। জুলপী চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দু খিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

—আরে দিগিনদাদা!

—যাচ্ছিস কোথায়?

—কাল রাতে জোর ধস্ নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজী তো খার্শাংয়ে আটকা পড়ে আছেন। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এপারে আসতে পারে তো নিয়ে আসবো।

দিগিন বলল—ধস্? কৈ আমি তো শুনি নি।

—শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট্ রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি।

আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। একসময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নী করেছিলেন দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন—বের হয়ে হবে কী? কাজ-কারবার কিছু নেই।

—কাজ নেই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরীবের বাড়িতে। ডিস্‌কাস্‌ করা যাবে।

দিগিন লক্ষ্য করেন, কাঞ্চনের জুল্‌পীর চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন—আসব'খন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে—শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেন্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে, শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন—বেশ আছিস কাঞ্চন।

—হ্যাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

—ও কথা সবাই বলে।

—জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা, বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়ে নি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারীর ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যবসাতে নেই, ওকালতী করে তার একরকম চলে যায়। মেজ জন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দুজন ভাইপোকে

নিজের ঠিকাদারীতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু থোক টাকা আছে—চলে যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন—শানুটাকে ব্যবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে—শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন—তোর সঙ্গে একদিন বসব।

—আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ঐরকমই বয়স। ভটচায বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানীতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

—কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষণ্ণ গলায় বলেন—এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু বেশী কথার মধ্যে গেলেন না। তিনজন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায শুধু বললেন—এবার পূজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

—হুঁ।

—আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—একটা খান। চুরুট খেয়ে খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজী চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফস্ফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচায বলেন—নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনো কিন্তু ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট্ থাকেন মশাই।

—ফিট্ থাকি নেশা করি বলেই।

—সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

—মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

—কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

—হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনো রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন—সত্যি ?

দিগিন চুরুটটা আরামে টেনে হেসে বলেন—কোনো মাতালের ছোটখাটো অসুখ দেখেছেন কখনো ? জেনুইন মাতালের ওসব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

—দূর !

—মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন ? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায চিন্তিত মুখে বলেন—তা বটে।

—তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজার-ভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কিনা।

—আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

—তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনী নেশা।

—না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে—অ্যালকোহল আরো ভাল। আজ রাতে আসুন আমার এখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াবো। দেশী জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেবো। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন—আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেণ্ট করবেন না তো ?

—গিনিপিগ ! বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন—আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপন মনে হাত দুখানা টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশী বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায় নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনো যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায আবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাঙ্ ধরাবেন না তো মশাই ?

দিগিন ভটচাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন—জীবনের একটা দিক একেবারে না জানা থাকা কি ভাল ? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপারে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কি কি রকম সব অভিজ্ঞতা হল—তখন তো ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন, বয়সকালে

রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেণ্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা যোগাবে কে ?

—ভূতে, নেশারু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

—না মশাই, আমার ওসব দরকার নেই।

—আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, একদিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায় ? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত একদিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেবো। ঐ সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

আচ্ছা যাবো, ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন। আজকাল আর তাঁর একাউণ্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতিমাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে, তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কি কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহ ভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন সাইটটা একটু দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাকগে, ঠিকাদারীটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা।

বাইক থামিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোলো না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নীচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিও স্টেশন পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক আধটা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারীর লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারাদিনই থাকে।

আধমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পৌঁছে যান তিনি। অনেককাল আসা হয় নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়ি-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রীর তৈরি দুচারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারী, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্প বয়সী বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এরকম একটু সংলাপ ভেসে আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে ?

বাকসিদ্ধাই—রোগা, ফর্সা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায় ?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

—জাত ?

—স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ স্বনিশ্বাসে বলে—বিয়েটা হবে ?

—হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতগুলো বাচ্চা খেলছে। উত্তরপ্রান্তে ক্ষেত। উদাস মাঠ, তার ওপাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজী চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালী কাঠখোট্টা এক মিলিটারী সওয়াল জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায় সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। একবার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে—ভাল তো ?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

—কী হয়েছে ?

—আমার ভাইপো—বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন—মা, আমার মরণ কবে ?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—সে দেরি আছে।

—কত দেরি ?

—অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

—ডাঙর মেয়েছেলে ? সে কে ?

—ফর্সা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ী মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন—কীরকম ক্ষতি ?

—পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

—বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো ?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলেন—সাবধানে থাকবেন ; তবে আপনার এখনো অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে—আর কিছু জানবেন না ?

—না, আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই !

বুড়ো মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে—শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেবো, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কি ? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুল্লি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন—কী রে ?

—ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

—চা, তার এত তাড়া কী ?

—বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে।

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে। বলেন—যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দকুলীকে বলে রেখেছি, সে রাজীও হয়েছে।

পুন্নি বলে—ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে—রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

—তোকে বসতে কেউ বলেছে?

—না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

—ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

—হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে—চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারাদিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনো ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত; তবু মনে মনে একরকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল গঞ্জ মতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যবসা, চা-বাগানের মালিকানা—কোনো চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামীর খেয়ালবশে একবার

মধ্যপ্রদেশেও চলে যান হীরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে! তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হীরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হীরে পান নি তা নয়। ছোট ছোট কমদামী কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনোক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জণ্ডিস ধরল, মাস ছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাঙ একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েও ছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন মনে হল—একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকীত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও—তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন—বিয়ে না করে একরকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পর ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ঐ বয়স থেকেই লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর বা নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্য-ব্যপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা দুটো দিন কাটাতেন। চারধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনো কোনো বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জ্বেলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস একদিন তাঁর শালীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বৌ ছিল নেপালী। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালী ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকীত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা

ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজী ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বৌয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারীতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরীতে পারিবারিক সব্জীর দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশী বয়স নয়—দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াস, বাঁধাকপি, বীন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালী কয়েকজন গ্যাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন—আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তো রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নীচু নজরে দেখে, কু-প্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কচি আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজী হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহুবার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁফ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালী ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনো অসুবিধে হয় নি। আকাশে তখন

ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পাল্টে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ঐ বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন—থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে ?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেয়ে-কেটে ষোলো, রাজী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল —যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তাহলে থাকব।

—থাকা মানে কী, জানো তো ?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনো পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনো রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেন নি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশী কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন—তোমাকে কলকাতা দেখাবো।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জীপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জীপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায়

যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়ে ছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করে নি।

টংগী ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস বা মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোনো সময়ে হাজির হতে পারে। পুলিস লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিনদিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

—কী খবর ভায়া?

—ভালই।

—ময়না?

—আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—জানতাম। বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার উপায় নেই। নেপালী পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, একবেণীতে বাঁধা চুল, খুশীতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশী হলেন। বললেন—ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকান নি। বলেন—তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজী নই।

—কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

—ওসব ছাড়ুন। ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপক্ষ হিসেবে।

—ময়না এরকম সম্পর্ক মানবে?

—মানবে আবার কী। মেনে তো নিয়েছে।

—না, মানে নি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করো নি। বয়স হলে বুঝবে।

—ও একরকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি।

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন—ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

—দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমী 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। বললেন—তাহলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল ?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন—হঠাৎ এরকম ধারা করতে গেলে কেন ?

দিগিন একটু ভেবে বলেন—আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনো ঠিক করি নি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাবো। ভেবেছিলাম আমার বাউণ্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নিচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁদিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে আরো সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কতবার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশেপাশে আবছায়ায় বিস্তর

লোক দাঁড়িয়ে দেখছে এসব। ঐ রকম খোলা জায়গায়, ঐ অন্ধকারের গভীর বিশাল সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামী আর নেই। যার একটা জায়গায় শেকড় গজায় সে বাকী দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন—আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরীতে কামড় বসিয়ে বললেন—তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে রে? রামরও?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন—মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

—চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকে নি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দুচারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনো দেন নি। তখন প্রাচীনপন্থী মা-বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায় নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশ-ভাগের পরপরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দুবছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও

বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে-করা বৌ বলে কখনো মনে করেন নি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশী নিজস্ব জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে—সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশী কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাঁটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে. বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনো বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশী বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু এক কথাতে সে রাজী হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না, কোনো অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশী ছিল না। বাড়ির লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে নি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু একটা স্বভাবদোষ মানতে কারো আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট্ট একটু বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন দিগিন নিজেই। ময়না যৌবনকালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোষায় নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল

নির্মল সিংয়ের ছোটছেলে অবতার সিংয়ের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে-করা বৌ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয় নি, বাঁজা ময়না এখনো নি সঙ্গ পড়ে থাকে ছোট্ট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছুদিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে, কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার বৌ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু তবু ময়না একা। বড় একা।

## তিন

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিক্‌শা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফর্সা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন—দেখেন, যেন ঠিক পাক্‌না শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন—সেই লৌকিকতা।

—না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ—একটু মিষ্টিমুখ আর কি।

—রক্তে চিনি একশ কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তাহলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেল পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে একপলকের বেশী চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরি করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে

দিতে বললেন—যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—রং তো কালোই, মুখশ্রী ঐ চলনসৈ।

পুন্নির বাবা বলতে গেল—কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বলেন—ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজ-কর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারী নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী দেবেন আপনারা?

—যা চান। দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন।

—চাওয়ার কী। আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

—যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

—হুঁ। বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন, বললেন—আলমারি তো গোদরেজের?

—তাই হবে।

—গয়না?

—চৌদ্দ-পনেরো ভরি।

—ঘড়িটা?

—রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন—আমি কী পাবো?

—মানে?

—ছেলে আর ছেলের বৌ তো এসব পাবে। আমার পাওনা কী?

—কী চান?

—নগদ।

—বলুন কত ?

—আমি বলব না। শুনব।

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাত জোড় করে বলেন—আমি কিছু বলব না, আরো চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অঙ্ক পেয়েছি। সব লিখে জামসেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপারটা পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নীপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন —দিগিন।

দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজী চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন—আমরা দুই হাজার নগদ দেবো।

—দুই ? ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

তারপর হঠাৎ বললেন—দশ।

—অ্যাঁ ! ভদ্রলোক তাকালেন।

—দশহাজার দেবো। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নীপতি সন্দেহের চোখে দিগিনকে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন মাথা নেড়ে বলেন—আচ্ছা নয়, দশহাজার নগদ দেবো।

বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ-গিনিপিগের মধ্যে কোন্ কথায় বা কোন্ অবস্থায় কীরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ্য করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফর্সা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলেন—আমার বড় আদরের ভাগ্নী। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন—সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ, নইলে একটি ব্রিলিয়াণ্ট এঞ্জিনীয়র ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তাহলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে। লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর একটু লাল করে তুললেন। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটায় একবার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন—আলমারিটা গোদরেজের তো?

—নিশ্চয়ই।

—সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন—পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেবো। আর প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের ছ গাছা চুড়ি।

—আমার ছেলে কী পাবে ? এ তো মেয়ের কথা হল, ভালই—

—একটা স্কুটার দেবো, একটা ফ্রিজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান। আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানী কেন, মেয়ের কোনো গুপ্ত খুঁত আছে কিনা এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন—আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

—না, না, তার কী দরকার ?

—খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী ?

বড়দা ভ্রূ কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেন নি। মেজদাও খুশী নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে—তাহলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক! বলে সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকাল। তাঁর দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন—সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন—মন্দ কী ?

—তাহলে ? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন—ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না ?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন—না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই

ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন—মেয়েটিকে আর একবার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনছে, এ কথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করে নি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন—মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড়বৌমা হবে তুমি। তা রান্না-টান্না, কি বুড়োবুড়ির একটু সেবা-টেবা—এসব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়মমাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিনবার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটে ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন—মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে?

ভদ্রলোক একরকমের হাঁফধরা হাসি হেসে বললেন—ঐ দেওয়াই হল।

—আমরা খুব বেশী দেরি করতে পারব না।

—দেরি করে আমাদেরই লাভ কী?

—তাহলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

—করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

—স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত

নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেণ্ডারী ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানি-সেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই এঞ্জিনীয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁফ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেইজন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবে না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার। সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের 'একজন। লেখাপড়া করে নি, জাতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকীপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সারারাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে একবার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশনে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেন নি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন—ওসব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে! বাদ দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশীদূর নয়। বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ওসব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ রাঙিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন শান্তনুকে ডেকে গোপনে বললেন—আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

—না।

—ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল—আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তা-কর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয়। এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আসামের নেফায় তাকে বদলী করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায় নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশী হয়েছিল। শান্তনু নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন—ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

—কেন ছোটমামা ?

—মিলিটারীর সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায় কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারো হাতে যদি পড়ে তো লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পেয়ে বলে—আচ্ছা।

—সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

—যদি দিতে না চায় ?

—দেবে, বলিস না দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল শান্তনু। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পুন্নির সঙ্গে। কিন্তু পুন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে. এ সত্য পুন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফল্‌স্ প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

শান্তনু ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শীগগীর আর আসবে না। এই ফাঁকে পুন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরী হয়ে এসেছে।

বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলেন নি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেন নি।

কয়েকদিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পুন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়ো চিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে!

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক? এবার নিশ্চিতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধহয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগী ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের ওপর পা তুলে দেন। পুন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পুন্নিটা খুব সেবা করত।

পুন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পুন্নি উঠে এল নিচে থেকে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

—কী?

—অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে?

—না হয় দিলাম।

—ছি ছি, লোকে কী বলবে?

—কী বলবে?

—ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগবে। বড়মামা, মেজমামা, মেসোমশাই কেউ খুশী হয় নি।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

—বলেছে।

—কী ?

—কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

—সে আমি বুঝব। তোর পাকামীর দরকার কী ? যা, চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে—আমি এ বিয়ে করব না।

—না করিস না করবি। আমি ঠিক দকুলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেবো।

—তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন ? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

—সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বৌদি এসে ডাকেন—দিগিন ভাই।

—হুঁ।

—তাজ্জব ! পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে ?

—করলাম।

এত কিছুতে রাজী হলে কেন ? কী এমন পাত্র ?

—পাত্র খারাপ না।

—তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা—তুমি কী ভেবেছ বল দেখি ? ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন ?

—মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টুঁ শব্দও করতে পারবে না।

—কেন ? আরো অনেক কমেই তো হত ! দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাৎ হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির

গিনিপিগকেই লক্ষ্য করছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখনই তিনি তাকে লোভানীর পর লোভানীতে উস্কে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠাণ্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ গিনিপিগের বেশী কিছু নয়।

বৌদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঠাকরোন, আজ রাতে ভাল করে শুঁটকী মাছ রাঁধো তো।

—কেন কেউ খাবে নাকি?

—হুঁ।

—কে?

—ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেণ্ট।

—মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন—ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

—বয়স হল, এখন ওসব ছাড়ো না।

—ছেড়ে ধরবটা কী?

—সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকী হলেই হবে নাকি?

—না। ঐ সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস, মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটেচচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বৌদি চলে যাওয়ার আগে বলেন—টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘী ঢালা হল। পারলে পাটিপত্রের দিন একটু কাটছাঁট কোরো।

—তাই কখনো হয়! কথা হচ্ছে কেথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

—তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস্ দিচ্ছে, ব্যবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন—ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকাদারী তো আছেই। চিন্তা কী?

বৌদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন—পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরীব হয়ে যাবো না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বৌদি শ্বাস ফেলে বলেন—তোমরাই বোঝো। আমি মেয়েমানুষ, আমার এসব কথায় থাকার কী?

—মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বৌদি বলেন—তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বৌদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধ্যে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোর মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে সব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝল্সে উঠছে।

সন্ধ্যের মুখে দিগিন পোশাক করে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাস গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধারে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউমার্কেটে আলো ঝল্সাচ্ছে দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধারে আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায় বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর

কংক্রীটের স্ল্যাব পাতা, তারপরে ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করেছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দুখানা ঘর, বাগান, কুয়ো সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রীল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালী ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পর্দা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝে মধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকী আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকীতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা, মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধহয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশী মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন—আও বেটা।

—কখন এসেছেন?

—বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমাদের ওখানে গেলেন না তো ?

—যাবো। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে।

পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনো দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো-খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোট হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড় বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিছু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালী ভাষায় কখনো কথা বলে না। এমন কি সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল—ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেও।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

—ও। ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোনো মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তার পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিক-টিক ফেলেন না। বার দুই তিন হেঁচকী তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—কি খবর-টবর ?

—ভালই।

—বন্মোরহো।

—আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব ?

—দিনের বেলা।

—আগেও তো দেখেছেন।

—জরুর।

—আমার মরণ কবে?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই সব জেনে কী হয় রে বেটা?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

—খোদায় মালুম। ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন—কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথাবার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোল বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চলল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এসব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরী বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন—রাখ্। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে একবার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্যভাব। বহুবছর ধরেই কি ময়না তার শূন্যচোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করে নি।

কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করে নি কখনো। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল একরকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনো বিশ্বাসের ভঙ্গ হয় নি। বৌয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশী সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারীর দোকানের সেই অশিক্ষিত মেয়েটির কী যায়-আসে! বরং উল্টোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌন-কাতরতার জন্যও নয়। সে বোধহয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারে নি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায় নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারে নি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনিপিগকেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনো করেন নি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারো বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পান নি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইশল্ বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাচ-বসানো আলমারি, আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

—ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

—কত ?

—বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ।

—আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন ?

—এমনিই।

—আমিও জিজ্ঞেস করেছি।

—কী ?

—বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

—ও।

—ফকির সাহেব বললেন যে বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছে করবে।

—তাই নাকি !

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

—কষ্ট কী ? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এসব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনো এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল—আমি কোথাও ঠিক চলে যাবো।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে—শুনছ ?

—শুনেছি।

—আমি কোথাও চলে যাবো।

—যেও, আমি তো কখনো বারণ করি নি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে—কেন বারণ করো নি ?

—কেন করব ?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালী মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানারকম পাপ-বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় নি।

প্রেশার কুকারের আর একটা হুইশল্ বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধু প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নিচে বসা ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন—আজ সকালে শা পুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন—সিদ্ধাই বলল, একজন ফর্সা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

—মেয়েছেলেটা কে?

—তা বলে নি।

—ফর্সা আর লম্বা?

—হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে কি আমি?

—কী করে বলি?

—কীরকম ক্ষতি?

—তাও স্পষ্ট করে বলে নি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন—বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।

—তুমিও তো বিশ্বাস করো!

—না, করি না।

—তবে গিয়েছিলে কেন?

—গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

—আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি

তো আমারই ক্ষতি। তুমি ভাল না থাকলে আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

—সেইজন্যই তো বলছি, সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

—শানু? চমকে ওঠেন দিগিন—কেন?

—তেমন কোনো কারণ তো বলে নি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

—কী বলল?

—বলল, কাকামা কিছু টাকা দাও, খুব লস্ যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন, বলেন—কাকিমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

—টাকা দিলে?

—দিই নি। বললাম, দেবো।

—কত?

–খুব বেশী নয়। দু'হাজার, তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

—কেন?

—ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন—ডোবাবে।

—কী?

—ঐ ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

—এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ওরকম করে ডাকে নি কখনো। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনো আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন—টাকাটা ওকে দিও না।

—কথা দিলাম যে!

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে ওর ক্ষতি হবে। যতদূর জানি ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

—চা'ক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না পারা ময়না ভিখারিনীর মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন—ইচ্ছে হলে দিও। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করেছে। তাছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দুখানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে—আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তাহলে কী করতে?

—শাসন করতাম।

—বেশী দোষ করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেবো। তুমি কিছু বোলো না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন—সোপস্টোনের পিছনে বহু টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলি নি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

—তুমিওতো টাকা কম নষ্ট করো না।

—সে করি রোজগার করে। ওর তো এসব রোজগারের টাকা নয়। ব্যবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, ভালবেসে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেবো।

—সবাইকেই তো ছাড়িয়ে দিয়েছো, কাকে নিয়ে থাকবে?

—আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে। তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে—শান্মু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন—কী বললে ?

—শান্তু বিয়ে করবে।

—কাকে ?

—পছন্দ করা মেয়েকে।

—তোমাকে কে বলল ?

—শান্তু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না।

ময়না নিজেই বলে—মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন। বললেন—ও।

—আমি কী করব ?

—শান্তুকে বলে দিও যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারী ব্যবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাজেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশী করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে—আমি কি তোমার বৌ ?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলেন—এসব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন ?

—ধরো যদি শান্তুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী। আমার মতো কাউকে বৌ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো ?

—পারি। দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

—কেন পারো ?

—কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শান্তুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

## চার

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশী। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলীর চাটটা টেনে নিয়ে বললেন—বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোটো খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই?

দিগিন হেসে বললেন—এ ছোটো খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন—এ মশাই চলবে না। বড্ড লাউড জিনিস।

—তাহলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা খিদে নষ্ট হবে। বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশী মদ গলায় ঢালেন।

—শুঁটকী মাছ আমি বড় ভালবাসি।

—একটু মাল টেনে নিন, আরো ভাল লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরো দু-এক চুমুক খান। বলেন—মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

—তাহলে আর একটু চালান। ঝিমুনীটা কেটে ফূর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন—এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচাযের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একবারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

—আর একটু দিই ?

—দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন—খুব দামী জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

—বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

—খান না মশাই, দামকে ভয় কী ?

—দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামী জিনিস' কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনো ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে ?

—একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোটো করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচায হেঁচকি তুলে বলেন—শুঁটকী মাছ!

—আসছে।

—খুব ভাল জিনিস।

—খুব।

—বহুকাল খাইনে, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয় ?

—হয়।

—সবাই খায় ?

—না। আমি খাই, আর বড়বৌদি। আর কেউ না।

—বৌ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন—কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে!

দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন—কে থাকবে?

—একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন—সে তো সবার থাকে।

—সবার থাকে? ভটচায হেঁচকী তোলেন।

—বিয়ে করলেই থাকে।

—না না, বিয়ে করা বৌয়ের কথা নয়।

—তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা। ভটচায অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন—তা বটে। তাহলে আপনার একজন আছে?

—একজন না, কয়েকজন।

—কয়েকজন? ভটচায চোখ বড় করে তাকাল।

—লোকে বলে না সে কথা?

—না তো! একজনের কথাই শুনেছি।

—লোকে কমিয়ে বলেছে!

—রাখেন কী করে? একজনেরই যা খরচ!

—রোজগার করি। রাখি!

—বেশ খরচা পড়ে, না?

—তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বৌ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি।

ভটচায মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলে—বাড়িতে বসে এসব খান, কেউ কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—আপত্তি করে না ?

—বাড়িটা তো আমার।

—তবু ফ্যামিলিতে কি এসব চলে ?

দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।

—তা বটে।

—ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।

—কী করব ?

—ফুর্তি।

—এই বুড়ো বয়সে ?

—ফুর্তির আবার বয়েস কী ? তাছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশী সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশী খাচ্ছেন।

—না, আর খাবো না।

—খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশী টানলে খাবার খেতে পারবেন না।

—দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন—ঐ! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হাল্কা লাগছে।

—লাগবেই তো। দেশীটা খেলে আরো বেরিয়ে যেত।

—হ্যাঁ, ফূর্তির কথা কী যেন বলছিলেন ?

—এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে—বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে—তখন কী বলবেন ? বলার কিছু আছে ? ঘ্যান্‌ঘ্যান্ প্যান্‌প্যান্ করে নাকি সুরে তখন পেটের রোগ, বৌয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট ক্রেডিট—এইসবই বলতে হবে।

যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে—যাও, ত্বনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখ নি।

ভটচাযের চোখ ত্বখানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন—শুঁটকী মাছ ?

—হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলেন—বাড়িতে বড় ধরাকাট! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায ত্ব চামচ ফ্রাইড রাইস খেলেন, একটুকরো মাংস, শুঁটকী মাছের চচ্চড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। পোর্টের গেলাস মুখে তুলে চকচকে চোখে চেয়ে দেখলেন দিগিনের দিকে। তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন—বৌ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন ?

—নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিক্‌শা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শান্তুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

—কে ?

—আমি।

—ছোটকাকা

—হ্যাঁ।

শান্তু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টায় দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রায়দিনই সন্ধ্যের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয় নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শান্তু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে—কিছু বলবে?

—হুঁ, বলে দিগিন শান্তুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদি পাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শান্তু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র‍্যাকে সাজানো। ওয়ার্ডবোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশী জামাকাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শান্তু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

—শান্তু।

—বলো।

—ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শান্তু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল—তুমি চিরটা কাল কাকীমাকে বড় হেলাফেলা করেছ

—কাকীমা!

—নয়?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শান্তু বলে—মানুষ যাই বলে বলুক, আমি জানি কাকীমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন—বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?

—সম্পর্কটা সহজ করতে।

—সেটা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?

শান্তু গম্ভীর হয়ে বলে—ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?

—অন্যায়?

—অন্যায় ছাড়া কী ? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে মর্যাদা—

—থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন ?

—চেয়েছি ধার হিসেবে।

—কেন ?

—সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

—সেটা আমাকে বলিস নি কেন ?

—বললে তো বকতে।

—এখন কি বকব না ?

শান্ত শ্বাস ফেলে বলল—সোপস্টোনের লস্‌টা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশী লস্ হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশী হযে গেছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবারাররা ক্ষেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের দুখানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন শান্তুর কোনো কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এসব কথা একটা জীবনে তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন—আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনো আছে। লোকে বলে, আমার হৃদয় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদ্‌গুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দুহাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনো শর্টকাট্ রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করেছি, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই

আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

—কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?

—একটা ব্রীজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

—জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাবো। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।

—লেবারাররা ছেড়ে দেবে না। ওদের অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে।

—সেজন্য কে দায়ী?

—আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। তখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

—খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কালই তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল।

—কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে—জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো।

—হলে হবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ছোটকাকা।

—বলো।

—আর একটু ভেবে দেখো।

—ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

—একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

—জানি। আমি বোকা নই।

—তবু যেতে বলছ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন—শুনতেই তো পাচ্ছ।

—ঠিক আছে।

—যদি লেবারাররা গোলমাল করতে চায় তাহলে কী করবে?

—কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেণ্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনো ক্যানসেল করে নি, সুতরাং বাকীটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শান্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—মনে রেখো লেবার পেমেণ্ট সবার আগে।

—আচ্ছা।

—আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ?

—অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

—তবু ছেড়ে দাও।

—এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে?

—কী বলবে? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেণ্ট দর কমাবে না।

—ভেবে দেখি।

—দেখ! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকীমা বলে

ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িও না।

শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করে নি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পযন্ত হয়। কখনো ঈশ্বর, কখনো শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে—তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

—তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে—আমি প্রতিবাদ করছি না।

—আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

—কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন—বুঝে দেখ।

—আমি খারাপ কিছু করছি না।

—তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন—তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতা-বশতঃ তোমার যে কোনো ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

—বলো, তাই ভেবেছিলে?

—না।

—তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন্ সাহসে?

—আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

—না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

—ঠিক আছে। বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

—আমি কাকীমার কাছে ওকে রাখবো না।

—তাহলে কোথায় রাখবে?

—অন্য কোথাও।

—রাখবেই?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন—না।

শানু তাকায়, বলে—উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন—তুমি কাল যাচ্ছ কিনা?

—যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—কালিম্পং আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে?

শানু মৃদুস্বরে বলে—কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্য যাচ্ছ তা হবে না।

—কী জন্য যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে?

—বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন—শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনো বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার

আগে বীয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুম চোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কনস্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে।

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নিচে, বহু নিচে তিস্তা। তিস্তার দুধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা ঝুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চীৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন। পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চীৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দকুলীর মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধহয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারাদিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দকুলীর বাপ চীৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনো বোঝেন নি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখার কোনো

মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

## পাঁচ

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন।

সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন—আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

—কেন?

—লিকার খাবো।

পুন্নি তাই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকারে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পঙ যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

—ছোটকাকা।

—উঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—না।

—আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

—কেন ?

—তুমি বললে যে।

—ও।

—যাচ্ছি।

—যাবে ? যাও।

—চেকটা লিখে রেখেছ ?

—হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে নাও।

শান্নু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়।

—সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক!—এত টাকার চেক কি বিনা নোটিসে ক্যাশ করবে ? শান্নু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে বললেন—করবে। ভটচাযকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শান্নু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খস্‌খস্‌ করে দুলাইন লিখে দেন। শান্নু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ঐ নিস্তব্ধতা কতবার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি ? কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনো যোগাযোগই নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দুলাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন—এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন—এখনই কেন?

—আমি কালিম্পঙ যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে-কোনো অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুকভাবে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন আর কোনো দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না—এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুনি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জীপটা রেডি রাখতে হবে, দুচার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরী কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ। ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে! সরু মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালী-সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপর দিকে নীল আকাশ।

টাকা—এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ঐ শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটরসাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রীটা উঠে এসে বলল—একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন

পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরোনো হয়েছে, সেটা পাল্টানো দরকার বলে নানানরকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘ কাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রঙ মোষের গায়ের মতো ভুষকো, তার পিছনে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডানদিকে আরো কয়েকটা রুপোলী চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরোনো হয় না।

উত্তর বাংলার কিছুই পুরোনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে, মানুষেরই অবিমৃষ্যকারিতায়, ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অত চড়াই-উৎরাই ছিল না, ছিল না অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোটো ছোটো কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোটো ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু, কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না, তাই রেলকোম্পানী লাইন তুলে দিল। ঐ স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙ যেতে হলে বরাবর ঐ ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন। রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুইই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনো কালিম্পঙে মোটরগাড়ির রাস্তা হয় নি। কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল—নামটা মনে পড়ছে না—বহুকাল হয় উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন

চা খেতে নামলেন। তখন যৌবনবয়স। প্ল্যাটফর্মের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট্ট কাঠের স্টেশনঘর, চারদিকে খেলনা-খেলনা ভাব, ছোটো লাইন, ছোট্ট সিগন্যাল, ছোটো নিচু প্ল্যাটফর্ম। তাঁর চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডানদিকে নদীর খাত, দুধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোল গোল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা। শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যাণ্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু মুঠিতে কিছু কাঁকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেন নি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা, মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেন নি, আদর করেন নি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন কত আদর যে করেন। সে কতো বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয় নি কি! কিন্তু সেসব মনে হয় না। কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ঐ কয়েকমুহূর্তের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, দুহাতে দু মুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখে লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে।

নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় এক অক্ষম পিতৃত্বকে ? কী হয়, কে জানে ! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি ! পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্য খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে !

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ। কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেন নি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জীপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন. তাঁরই জীপ, শান্তুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জীপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলের, চোখে বুর্ভামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানীর ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয় নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোটো মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও। মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শান্তু ওকে সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাব্‌জীর জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোটো গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা। সরাব্‌জী থেকে সাহেবের নাম করে দু-বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বৌ মরল। মল্লিকা তখন দু আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ঐ মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোটো দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতা

বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো করে। বদলে বাপ বেটিতে পেটভর ভাত খেত দুপুরে, রাতের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে মাঝে রাঁধতও কপিল, মুর্গীর ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছ ছাড়া করত না। গ্রামে গঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়েহারা বাপ সক্কালবেলায় কারো কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে। ডাকে নি, শব্দ করে নি। দিগিন তখনো ওঠেন নি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়েছিল টংগী ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জীর ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তন শুনে মরার আগে যে নামাবলীটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়ানো। দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোঁক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন। শান্ত তাড়াতে বলে। তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়েহারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভাল নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানারকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে সেখানে পড়ে থাকে। সেসব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালীরাই

এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালী চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট, কাঠ, রং সে কিছু কম চুরি করে নি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালবাসা আছে। জিনিস না বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালী আর ভুটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক একবার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রীজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বৌ ছিল, নাম ছিপ্‌কি। দু গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপ্‌কি, আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নীচু শ্রেণীর মানুষেরাই ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপ্‌কি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাচের চুড়ি, রঙীন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের স্খলিত গলার নানান শব্দ আসত। ছিপ্‌কির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পর্দার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। এক সময়ে মিলিটারির ল্যান্স নায়েক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা, গায়ে কুর্তা, কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজা থাকত কুক্‌রি। নেপালীরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ী অঞ্চলে পেটে ঠাণ্ডা লেগে একরকমের হিল-ডায়েরিয়া হয়, সহজে

সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালীদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপ্‌কিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশী রাতের দিকে ছিপ্‌কির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিপ্‌কিকে নিয়ে। সামনের দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত, তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমী রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে ছবার চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হন নি। মহানন্দা পুলের কাছে ঐ দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও ছচারবার লক্ষ্য করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জীপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুরে বাতাসে। অন্তত চার পাঁচ পেগ নীট হুইস্কি ছিল পেটে। মেজাজটা ছরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধহয় খদ্দের জোটে নি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলী সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। ছচার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার।

মুখটা পাল্টে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম গরম চা হুস্ হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জীপ্ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন ?

ছিপ্‌কির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার —কী পাওয়া যায় এখানে ?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে —চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না ?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগিনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না. মেয়েমানুষের মাংস ?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জীপ্‌টা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন—দর কত ?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনো পায় নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালীতে বলল—লোকটা কী বলছে শুনছো ?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস্ করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা ?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে।

মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা।

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পর্দাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পর্দা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো। সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসে ছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপ্‌কি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি। সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করে নি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমী নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশী করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কপিলের এঁটো, কিংবা কপিলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝট্‌কায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবদ্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহীন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খস্‌খসে ভাব। গলার চামড়ার ভাঁজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালীতে বললেন—ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল—সঙ্গে থাকে।

—স্বামী?

ছিপ্‌কি মুখ ভ্যাঙাল।

—দেখি তোর হাত। বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্টমনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রূ কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন—দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভাল। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল—কত জানি না।

দিগিন বললেন—বাইশ তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল—কী হবে?

—তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, হাতে সব লেখা আছে। এ লোকটার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরো পঞ্চাশটা টাকা ছিপ্‌কির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন—তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব

মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি, তুই যখন বড় হবি তখন এসব দশবিশ পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভাল চাস তো কালই পালিয়ে যা।

—কোথায় যাবো ?

—কোথায় যাবি !

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন—শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠগোলায় চলে যাস। শনিবার মঙ্গলবার থাকি। কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো। ফিল্‌মে নামবি ? আমার দোস্ত আছে।

ছিপ্‌কির চোখমুখ কী রকম যে উজ্জ্বল হয়েছিল ফিল্‌মের নামে ! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধহয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুঁইয়ে বয়ে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ী নদী। তারই জল ছুঁয়ে এক বুক রক্ত ঢেলেছে ছিপ্‌কি। কুক্‌রিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

লোকটা একমাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এরকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত। চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা নিয়ে আসত হাসপাতালের মর্গে। দুচার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাঙড়রা ফের চাটাইবাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁততো। ছিপ্‌কির জন্য এখনো একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেন নি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রূ কোঁচকালেন দিগিন। রূঢ়

মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনো দিগিনের চোখে চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিংয়ের কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তির শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেলখানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে ঢালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাজে পাঠিয়ে দেন। বলছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনো কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনোকালে সন্ধ্যের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরীটা পাস করতেই। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে খুব গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেণ্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেণ্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যান দিগিন। সোপস্টোন মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারীও যাবে। চ্যাটার্জি কন্‌স্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশী লাভ খাবে, প্রথম লরীটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না! আবার তৈরী করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবো'খন।

দিগিন চিন্তিতভাবে জীপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সীটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশী নয়। সবাই যেন পাকেপ্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে। গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশী স্ট্রেচ প্যাণ্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জী। নীল প্যাণ্ট, আর হাল্কা হলুদ গেঞ্জীতে খুবই ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবী ধরনের

চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জীপ থামতেই শান্তু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয় নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে?

—তিন চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোটো কাজ ছিল, বেশী মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছো?

শান্তু একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শান্তু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তা ছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো। আমি কথা বলে যাবো, তুমি একটা জীপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্ত্রি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল—আজই ঢালাই করে দেবো। আপনি যান।

জীপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জীপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। একবার চেয়ে দেখলেন, শান্তুর মুখ খুব গম্ভীর,

প্রেস্টিজে লেগেছে বোধহয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জীপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জীপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্য মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জীপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরাল জীপ। দিগিন চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল—অনাদিবাবুর গোলায়।

—কখন?

—ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়ের লরী এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

—কততে বেচলি?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল—শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিনচার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরে কেটে হাজার খানেকের মতো হবে। আমি তিন শো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধ স্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কূটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশ টাকার তিনটে নোট, ভাঁজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন—সেবক রোড ধরে চল।

বিনা উত্তরে নিউমার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণীমোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাওয়ার পর থেকেই ওরকম। ওর ভালবাসার, স্নেহের কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনো অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি

আসে কখনো, তো ভাল, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

## ছয়

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরী। তেল চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাবে আহ্লাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভাল। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোটো, দীঘল কালো চেহারা। কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে আসলে দেখেন নি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পর্দার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরীরা বারেন্দ্রশ্রেণী, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন—ভাল দুটো বারেন্দ্র-শ্রেণীর পাত্র খুঁজবেন তো চাটুজ্জে। এসব পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সালের কথা। তখনো ময়নাকে আনেন নি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরী এসে বললেন—আমার বাড়ির ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিজ্ঞেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে!

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন প্লেস করা গাড়ির একটা ইন্টার ক্লাস কামরায় চৌধুরীর দুই মেয়ে, বৌ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়, তখন অফ সিজিন চলছে। ফাঁকা কামরাটায় তারা মাত্র কজন। সে যে বয়ঃসন্ধির

আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব! নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনো মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্যা ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরীর বৌ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরী-গিন্নি টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দুচারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনী পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসি প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নি আর ছেলে একটা সীটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না!

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানী শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনো ঐ ভাবে ছিল। খায় নি। তার নাকি খিদে নেই। মেয়েটা অদ্ভুত। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ঐ কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে?

মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুলচাল-গুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা! বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরী প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হাল্কা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরী গিন্নি ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

—গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়! দেখিস।

—উঁ, তুমি ঘুমোয় না!

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরীগিন্নি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ঐ রোগা একরত্তি মেয়েটার অত দেমাক কিসের? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। শুধুমাত্র শরতের ঠাণ্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনোদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধু-ধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেবো? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসে রইল।

—শুনছেন! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

—আপনার অস্থবিধে হবে না তো!

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ঘোরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন। সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরীর মতো, রূপসী জীনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের! কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ঐ মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না! আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই ঘুমিয়েছে। চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুট্‌খাট্‌ একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন! ঐ যে একটু খুট্‌খাট শব্দ হল তাইতেই চৌধুরীগিন্নি উঠে বসলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কিনা।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কূট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাঠ হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণীর শেষমাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একবারে প্রথম রাতে না ঘুমোলে তাঁর ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাঁহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেণ্ডার সিগারেট একটা বের করে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটু ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগন্যাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল। ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেকদূর পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভূতুড়ে মাঠেঘাটে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জীন ছিল, পরী ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল—ক'টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন কিনা। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন—একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন—তুমি ঘুমোও নি।

—না। ঘুম আসছে না। যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ—এত ক্ষীণ আর নরম গলা।

—আমিও না। দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনীটা সামলালেন। বললেন—তুমি কিছু খেলে না।

—আমার খিদে পায় না।

—কেন?

—এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কানে বলা। তবু কি আশ্চর্য তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়!

—কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

—বেশীদিন না।

—বেড়াতে যাচ্ছো?

—হুঁ। মামার বাড়ি।

—আমি সাতদিন পরে ফিরব। তোমরা?

—একমাস।

আর কি তেমন কোনো কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল। দিগিনকে প্রায় গহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনো প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবুও এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে একমাসের নাম করে বহুকাল

থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনো হয় নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল আর ওরা আসে নি। চৌধুরীগিন্নি অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপ্পান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব কমবে, সময়ও বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটার গেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যানশিপমেণ্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্র্যান-শিপমেণ্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশনমাস্টাররা ট্র্যানশিপমেণ্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর একরকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশনমাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালি, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তাঁর মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পাল্টে গেল, একটা ওপেন ডেলিভারী নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখছুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন—চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানা-শুনো, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন—এত টাকা! কখন কি হয়!

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও পাল্টেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকে। বেশীর ভাগ জিনিসপত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর বাড়ি হচ্ছে, ছুটো বাড়ি, একটা বৌয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে ছুটো ঘর। ভিতরের ঘরটায় সব সময়ে তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় ছুটো ক্যাম্প খাটে বাপ ব্যাটা শোয়। ঝি চাকর কাউকে রাখেন নি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর ছুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লীভ নেবেন না, ঐ অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায়

পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরী এখন টাকা চিনেছেন, টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ন খড়ি ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে—আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগ্নেদের হাতে পায়ে ধরলেন। বোন বললেন—দাদা, আমি কী করব! ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, কদিনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেণ্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলে মেয়ে বৌ, সুখের সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত। কিন্তু ঐ বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তার পর হলদি-বাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়লোকীর একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে। তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরীব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরীব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেন্ট কথা ছিল—এমনি লস্ সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস্ সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত—ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই ক্ষেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পযসা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমিও বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম, দিতাম না। সে ক্ষেপে গিয়ে লোককে বলে বেড়াত—নেম্মলটা খচ্চড়। দে'লে, নে'লে, দে'লে, নে'লে, ফের দে'লে ফের নে'লে। নেলে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ঐরকম। মাঝে মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জীপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ী রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রীজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনো বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দুধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেললাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বে-খেয়ালে গরমজামা আনেন নি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়াল খুশীমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরমজামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনো তাঁর কোনো কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায় নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন—কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয় নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—কালিম্পঙ যাবেন তো ?

—তাই তো যাচ্ছি।

—দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।

কাজ ! কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চারধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরোনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরোনো রেললাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরোনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

ডাকলেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—ঠিকাদারের চৌকিদারী তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কি কপিল ?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন—তোকে একটা বাগান বানাতে দেবো। শাল-বাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো !

কপিল হুঁ দিল।

—ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল···

—মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল। দিগিন ভুলে গিয়েছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো ভীষণ চকচক

করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমনে একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কি আছে? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পাল্টে যাচ্ছে। চতুর, ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন—পারবি না?

—খুব।

—কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জীপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেই সঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা, ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ী গরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয় গভীর উদ্ভিদজগতের নেশাক গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশে আর তিস্তার ওপারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট। জীপটা গুম্‌গুম্‌ শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের গলার বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন। দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশী দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তাই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ঐ দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানক্ষেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ী জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পঙ ব্যতিক্রম। এইজন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেত-পাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পঙ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন দিগিন। ঐ শ্বেতপাথরের কেদারায় গদী পেতে বসতেন। আদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমা দেবীকে দেখেছেন। ঐ কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনো। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী!

সেই রবীন্দ্রনাথের সেন্টেনারী হয়ে গেল। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়! বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জীপে উঠলেন এসে। ডাকলেন—রমণী!

—আজ্ঞে।

—শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

—সেখানে চল। বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন—তোরা কিছু খাস নি?

রমণী মাথা চুলকে বলে—আপনারও হয় নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমানে সমানে বসে খেলেন।

দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ঐরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশী। চাকর, তবু যেন অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তলিয়ে দেখেন নি দিগিন। গোলমেলে। একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জীপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে—সেই খানে তো ?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারী। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসী বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা। বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশী বলে, আর নান্ বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই ফরাসী সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশবছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন—কোথায় ?

—সেই মিসট্রেসের বাড়ি ! রমণী বলে।

—কোন্ মিসট্রেস ?

—যেখানে শানুবাবু আসেন !

—ওঃ। দিগিন বুঝতে পেরে বলেন—মেয়েটা মিস্ট্রেস্ বুঝি ?

—না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন—শানু প্রায়ই আসে ?

—সপ্তাহে দুতিনবার।

—বিধবা! তাহলে বয়স কত ? বেশী ?

—না। কম।

—বাচ্চা-কাচ্চা নেই ?

—না। বালবিধবা।

—এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি ?

—এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

—নিখিল ব্যানার্জি! সে কে ?

—আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তর বাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটে নি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দুজন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দুজন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, দায়দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত—মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সেসময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট

দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইস্‌লামিক হিস্ট্রির এম-এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুব কম। বসে খেত। বৌ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দুজনের ঝগড়া হল। প্রেম কতদূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পঙ থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামী মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

—শানু এখানে জুটল কি করে?

রমণীমোহন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল—সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তারপরই চেনা জানা।

—কে কাকে ভজাল জানিস?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে—শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটা একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জীপ-এর শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধহয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নীচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনো লম্বাটে, টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে না যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ্ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন—মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

—আমি শান্ত চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহু দিনকার পুরোনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা। ফুলদানীতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনো ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাংদুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে, দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন—এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পর্দার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ

হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফর্সা হাত পর্দাটা সরাল। রঙীন ছাপা শাড়ি পরা, ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন—নামটি কি ?

—অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল ?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দুধারে দুবার ফেরাল। অর্থাৎ না।

—তোমার স্বামীর পদবী কী ছিল ? দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

—ভট্টাচার্য। ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

—তাহলে ব্যানার্জি বললে কেন ? ইচ্ছে করলেই কি পদবী বদলানো যায় ?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধহয় বাইশের বেশী কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

—কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ?

—ষোলো। তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

—এখন কত বয়স ?

—একুশ।

—বিয়ের কদিন পর স্বামী মারা যায় ?

কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা একবার করুণাভিক্ষু চোখদুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল—ছ মাস।

—কী হয়েছিল ?

মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

—ও। বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর, মুখ তুলে বললেন—তার কথা তোমার মনে পড়ে ?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

—মনে পড়ে না ? দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দুখানা তুলে তাকাল। কী মায়া থাকে চোখে! কী বিপুল ফাঁদ! দিগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—না।

—এত অল্পবয়সে তোমার বিয়ে দিল কে ? কেনই বা!

—আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর···বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না বোধহয়।

দিগিন বললেন—আমি তোমার মা বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

—বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাই নি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেন নি। তবু অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন—যাও, কফি করে আনো।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা পড়েছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এসব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না উঠছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেন নি।

মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশী হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন—কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেও না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বোলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশী মিশো না, বুঝলে?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুতরাতে।

বাইরে অবশ্য এখনো শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

জীপে উঠে দিগিন আর একটা চুরুট ধরালেন। বললেন—চালা। মেহের সিংয়ের দোকানে একটু থামাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিংয়ের দোকান থেকে একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোটো। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জীপ দাঁড় করিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোটো পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জীপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

## সাত

কয়েকদিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামালেন দিগিন। পিছনের সীট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরানো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু'বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরো দু'বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে···' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল—এখানে আনলে যে!

দিগিন ভ্রূকুটি করলেন, বললে—কেন, খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল, বলল—ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন—যাবে ওখানে?

ময়না বলল—তুমি গেলে যাবো না কেন?

—এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পৌঁছোয় নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল—আর যেও না।

—কেন ?

—সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল—যদি না আসো ?

দিগিন ভ্রূ তুলে বললেন—আসব না কেন ?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলে—তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনো কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—ও। বলে দিগিন ভাবলেন, বললেন—যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পৌঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ঐরকম। অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার মস্ত শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশামাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারিদিকে ভূতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেকদিন ঘুমোন নি, বিশ্রাম নেন নি। অনেকদিন যেন আবার কোনো শক্ত কাজও করেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে। প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

—তোমার পায়ের শব্দ পাই নি তো! বললেন দিগিন।

—তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গীতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটি চুম্বন করলেন। কোনো কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধহয় তা বুঝল। বলল—এমন সুন্দর আদর আর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারিদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না।

কয়েকদিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দুখানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকীত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোন দুর্জ্ঞেয় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে

অঙ্কুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ—নদীর উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকে নি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেলে করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরির কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘন্টি বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘন্টি বাজবার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

—আসছি। বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন—টানতে পারবে তো লাহিড়ি ?

—পারবো।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চারধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

—পারবে তো লাহিড়ি ? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁফ-ধরা গলায় বলে—পারবো, পারতেই হবে।

—বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

—না হে, তোমাকেও তো এরকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন—লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এরকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন—সাদা অন্ধকার! অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনোদিনই আর নিলেন না।